Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1& 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

ব্রুনো লাতুরের তত্ত্ব-ভাবনা পরিচয়

(Introduction to the Theoretical Ideas of Bruno Latour)

ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু*

সার-সংক্ষেপ

ফরাসি দার্শনিক, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী ব্রুনো লাতুর একজন প্রভাবশালী সত্যোত্তর (পোস্ট-ট্রুথ) চিন্তাবিদ। সমসাময়িক পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীতার ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য অবস্থান তৈরি করেছেন। লাতুরের সমাজচিন্তার সাথে বাংলাভাষী পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় থেকে এই প্রবন্ধের শুরুতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেছি। এরপর তাঁর তত্ত্ববিশ্ব থেকে সমাজবিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী পাঠকদের জন্য উপযোগী বিবেচনা করে তিন ধরনের তত্ত্বায়নের উপর পর্যালোচনাধর্মী আলোচনা হাজির করেছি। তিন ধরণের তত্ত্বায়ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ তাঁর মৌলিক তাত্ত্বিক অবদান, সমাজবিজ্ঞান চর্চার সাথে সামঞ্জস্যতা ও সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ডে তত্ত্বের প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়েছে। তত্ত্বায়নসমূহ হচ্ছেঃ প্রথমত, সামাজিক নির্মান, বাস্তবতা ও বিজ্ঞান; দ্বিতীয়ত, 'না-মানুষ' ও অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি; ও তৃতীয়ত, অ-আধুনিকতার ইস্তেহার। এই তিন ধরণের তত্ত্বের উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারকে প্রাধান্য দিয়ে সবশেষে জ্ঞানজগতে চালু থাকা সুনির্দিষ্ট সমালোচনাসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে। এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের সাথে প্রাসঙ্গিক লাতুরের তিন ধরণের তত্ত্বায়নের আরও গভীরতর পর্যালোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

Abstract

Bruno Latour, a distinguished French philosopher, anthropologist, and sociologist, has emerged as a pivotal figure in the realm of post-truth discourse. This article aims to introduce Bengali readers to Latour's social thought by examining his life and intellectual contributions. To facilitate a comprehensive understanding for those interested in sociology, I will analyze three seminal theories from Latour's theoretical repertoire. These selections are informed by his foundational contributions, their relevance to sociological practice, and their broader implications for contemporary intellectual discourse. The theories under consideration include: i) Social Construction, Reality, and Science; ii) Non-Humans and Actor-Network Theory; and iii) Manifesto of Non-Modernity. This article will crystallize the origins, characteristics, and dissemination of these theories while

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইলঃ debasish.k@du.ac.bd

DOI:

also addressing the specific criticisms that have arisen within academic circles. I intend this critique to foster a deeper exploration of Latour's contributions and their significance for sociology.

ব্রুনো লাতুরের জীবন ও কর্ম

১৯৪৭ সালের ২২শে জুন ফ্রান্সের বারগেন্ডির বুনেতে ওয়াইন উৎপাদনকারী এক পরিবারে ব্রুনো লাতুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে একজন সত্যোত্তর (পোস্ট-ট্রুথ) দার্শনিক, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও বহুল উদ্ধৃত তাত্ত্বিক। ফ্রান্সের সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন এবং তাঁর চিন্তাসমূহকে সবচেয়ে বেশি ভুলও বোঝা হয়। তিনি শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন চর্চায় আগ্রহী ছিলেন[1]। ১৯৭১-৭২ সালের দিকে তিনি ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথমে দ্বিতীয় ও পরে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি তুরস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করেন। তাঁর অভিসন্ধর্ভের শিরোনাম ছিলো- ব্যাখ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা: পুনরুত্থানের মূল পাঠ বিশ্লেষণ।

আইভোরি কোস্টে কাজ করার সময় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করে তিনি বিউপনিবেশায়ন, নৃগোষ্ঠী ও শিল্পসম্পর্ক নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতেও মাঠকর্ম পরিচালনা করেন। লাতুর পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এছাড়াও তিনি বিজ্ঞাননীতি ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯৮২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে অবস্থিত ইকোলে ন্যাশনাল সুপিরিয়র দে মাইনের সেন্টার ডি সোশিওলজি ডি ইনোভেশনে অধ্যাপনা করেন। এর মধ্যে ২০০৭-২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি সায়েন্স পো প্যারিসে গবেষণা সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন[2]। ২০২২ সালের ৯ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে তিনি মারা যান।

এ পর্যন্ত তিনি বিশটিরও বেশি পুস্তক ও ১৫০টিরও বেশি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি রচনা চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। এসব পুস্তকে তিনি এমন কিছু প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন, যা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে ও বিশ্লেষণে উদ্ভাবনী মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর রচিত *ল্যাবরেটরি লাইফ*, *সায়েন্স ইন অ্যাকশন* ও *পাস্তুরাইজেশন অব ফ্রান্স*- এ ধরণের কাজের উদাহরণ। তিনি স্বয়ংক্রিয় ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা বা প্রযুক্তির ভালবাসা নিয়ে কাজ করেছেন, যার নাম- *অ্যারামিস-দ্য লাভ অফ টেকনোলজি*। প্রতিসম নৃবিজ্ঞান নিয়ে গভীর আলোচনার পুস্তক '*উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন*' এ অ-আধুনিকতার রূপরেখা হাজির করেছে। এছাড়াও প্যান্ডোরার প্রত্যাশা: বিজ্ঞান যুদ্ধের ফলাফল কেমন হতে পারে- তা নিয়ে সামাজিক অধ্যয়নের বাস্তবতা সংক্রান্ত প্রবন্ধ তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতীর নিদর্শন। শেষের দিকে তিনি পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, ও প্রকৃতির পরিবেশগত রাজনীতির রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কাজ করেছেন। কোভিড-১৯ নিয়ে তাঁর প্রকাশিত বইটিও যথেষ্ট আলোচিত হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে লাতুরের প্রধান তিন ধরনের তত্ত্বায়নের উপর পর্যালোচনাধর্মী আলোকপাত করা হলো।

সামাজিক নির্মাণ, বাস্তবতা ও বিজ্ঞান

লাতুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান দিয়াগোতে সাল্ক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিকাল স্টাডিজের নিউরোএন্ডোক্রিয়োলজি ল্যাবরেটরিতে স্টিভ উলগারের সাথে দুই বছর ধরে এথনোগ্রাফি করেছেন। লাতুর পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ (এক্সপেরিমেন্টেশন) দেখেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নামে এগুলো কিভাবে আয়োজিত হয় -তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। আবার লক্ষ্য করেন কীভাবে

মাত্র একটি পরীক্ষণের আলোকে তত্ত্বের উত্থান-পতন ঘটে, যার সাথে হয়ত পরীক্ষাগারের অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মিল সামান্যই, অথবা একটু পাল্টে দেয়া হয়েছে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ব্রুনো লাতুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হওয়া বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। বিজ্ঞান আসলে কি? কেবলমাত্র পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্য উৎপাদিত হয়? এই ধরণের প্রশ্নসমূহ বিজ্ঞানচর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা তার আগে খুব বেশি শুনেছেন বা উত্থাপন করেছেন বলে মনে হয়না। লাতুরের এই প্রশ্নগুলো কি জ্ঞানরাজ্যে বিজ্ঞানের যে একচ্ছত্র আধিপত্য ও উচ্চাসন- তা কি টলিয়ে দিয়েছে খানিকটা? লাতুর কেবল এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না, এসব প্রশ্নের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করলেন। এই ব্যাখ্যা নিয়ে তৈরি হলো (স্টিভ উলগারের সাথে যৌথভাবে রচিত) বিখ্যাত বই, *ল্যাবরেটরি লাইফ*। এই বই মূলত বৈজ্ঞানিক সত্য/ প্রমানের বিভিন্ন ধাপ ও সেই সময়ে উদীয়মান বিজ্ঞান অধ্যয়ণের বিভিন্ন উদ্ভুত বিষয়কে কিভাবে ফ্রেম করা যায়- তারই দলিল।

যে বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের ঘেরাটোপে বন্দী, বিজ্ঞানীদের ভারী চশমার কাঁচ পেরিয়ে সমাজ কোনদিন সে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত (উৎপাদিতও বটে) সত্যের সর্বজনীনতা ও চিরন্তনতা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারতো না। জ্ঞান জগতে বিজ্ঞানের সেই নাকউঁচু ও একগুয়ে অবস্থানকে নিশানা করে লাতুর বৈজ্ঞানিক সত্যের সামাজিক নির্মাণ এর ধারণা দিলেন। পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান আসলে কি করে- সেই প্যান্ডোরার বাক্সটাকে লাতুর যেন সাধারণ মানুষের সামনে উন্মোচন করে দিলেন। তাতে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীরা বিরক্ত হলেন, অবিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নামে তাহলে এসবই করেন। বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা লাতুরের উদ্দেশ্য ছিলোনা। তবুও তাঁর খুব বদনাম হলো বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে। আসলে লাতুর পরীক্ষাগারের ঘেরাটোপ থেকে নানা বিদ্যায়তনিক পরিভাষার নিচে চাপাপড়া বিজ্ঞানকে উন্মুক্ত করে দিলেন অবিজ্ঞানীদের জন্য। পরীক্ষাগারে কর্মরত বিজ্ঞানী, প্রশাসনিক ও গবেষণা কর্মকর্তা, পরীক্ষাগার সহকারি, পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নিয়মকানুন ও বাজেটের উৎসসহ বিজ্ঞানী কিংবা ফান্ডিং এজেন্সির পরিচয়, কোন এলাকার গবেষণাগার, ধর্ম-বর্ণ-পরিচিতি, রাজনৈতিক দর্শন ও পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রভৃতিও যে বৈজ্ঞানিক সত্য নির্মাণে ভূমিকা রাখে -তা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে যুগের পর যুগ এক ধরণের অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিলো। ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা সম্ভব ছিলো না। বিশেষ করে, যে পরিসরের মধ্যে ও যেভাবে এইসব জ্ঞান তৈরি হয় -তা নিয়ে।

পরীক্ষাগারে এথনোগ্রাফি করতে নিয়ে লাতুর দেখলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নামে এখানে অনির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট নয় কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সম্ভব নয়- এমন উপাত্তও তৈরি হয়। এগুলো সাধারণত পরীক্ষণ পদ্ধতির অসাড়তা কিংবা কোন যন্ত্রপাতির ব্যর্থতার সাথে সম্পর্কিত। কখনো কখনো এগুলো পরীক্ষণপরিকল্পনার দুর্বলতা হিসেবেও মনে হয়। আবার দেখা গেছে, পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত সব উপাত্ত ব্যবহার করা হয়না। কোন উপাত্ত ব্যবহার করা হবে, আর কোন উপাত্ত ছুঁড়ে ফেলা হবে -এই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে এক ধরণের বিষয়গত বা প্রেক্ষিতনির্ভর উপসংহার টানা হয়। কাজেই সর্বজনীনতা বা বৈজ্ঞানিক সত্যের নামে প্রতিষ্ঠিত নিরপেক্ষতা ও সঠিকতা নিয়ে অবিজ্ঞানীরা যতই মাতামাতি করেন না কেন, গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তের মধ্যে কোনগুলো ফেলে দিলে বা আমলে না নিলে বৈজ্ঞানিক অনুসিদ্ধান্ত যথেষ্ট পরিমানে 'বিজ্ঞানসম্মত' হয়ে উঠবে- বিজ্ঞানীরা সেই অনুশীলনই করেন। লাতুর এক্ষেত্রে খুবই ভিন্ন ধরণের ও বিতর্কিত মতামত দিয়েছেন- তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লাতুর বলেছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তুসমূহ পরীক্ষাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে সামাজিকভাবে নির্মিত হয়েছে। সৌকাল হক্সের

অ্যালান সৌকাল মনে করতেন যে, লাতুর সম্ভবত বলতে চাইছেন, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো এক ধরণের সামাজিক বিধি ছাড়া আর কিছু নয়। লাতুরের চিন্তাপদ্ধতি অনুযায়ী, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে বিশ্বাস, মৌখিক প্রথা ও সংস্কৃতি (রাজনৈতিকও বটে) নির্ভর অনুশীলন বলে মনে করা হয়। এগুলো পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির বাইরে গিয়ে প্রকাশ্য হতে পারেনা, কারণ এসবের মধ্য দিয়েই তাকে মাপা হয়, আবার বিজ্ঞানীরাই এগুলোকে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত লাতুরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই, *সায়েন্স ইন অ্যাকশন: হাউ টু ফলো সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারস থ্রু সোসাইটি*[4] অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীরা একটা নতুন ধরনের সহযোগী সংগঠনের নামে কথা বলে থাকেন, যে সংগঠনকে তারাই তৈরি করেছেন এবং নিজেরাই তার সদস্যপদ নিয়ে থাকেন, প্রতিনিধি নিয়োগ করেন ও প্রতিনিধিত্ব করেন। আবার ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে অপ্রত্যাশিত সম্পদের ব্যবহারও করে থাকেন। এই বইতেই লাতুর প্রথম না-মানুষ (নন-হিউম্যান অ্যাক্টর) এর কথা বলেন।

বাস্তবতা কি? এই প্রশ্ন লাতুরকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস[5]-এর এক লেখায় সে প্রসঙ্গই ঘুরেফিরে এসেছে। কোন জিনিস যে বাস্তব -তা বোঝার গৎবাঁধা রাস্তা আছে। দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান থেকে আমরা এটাই জেনে এসেছি যে, বৈজ্ঞানিক সত্য/ প্রমান ও বস্তু এখানেই এই পৃথিবীতে ছিলো (বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ার আগে), বিজ্ঞানের বদৌলতে বিজ্ঞানীরা সেই সত্য উন্মোচন করেছেন বা আমাদের সামনে হাজির করেছেন মাত্র। লাতুর একটু দ্বিমত করে বললেন, বৈজ্ঞানিক সত্যকে বরং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল হিসেব দেখা উচিৎ। সত্য/ প্রমাণ সবসময় নেটওয়ার্কের মধ্যে অবস্থান করে। এটা তাদের অপরিহার্য্য অকৃত্রিমতার শক্তির ওপর নির্ভর করে দাঁড়ায় না, বরং প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই সত্যগুলো তৈরি হয় ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। এই নেটওয়ার্ক না থাকলে এই সত্যও আর দাঁড়িয়ে থাকেনা। গত শতকের মধ্য নব্বইয়ের দশকে পুরো দুনিয়া যখন বিজ্ঞান যুদ্ধে মাতোয়ারা, তখন বাস্তববাদ ও সামাজিক নির্মাণবাদ নামের দুই তাত্ত্বিক ঘরাণার মধ্যে কঠিন বাহাস হয়। বাস্তববাদীরা মনে করেন, সত্য/ প্রমাণ নৈব্যক্তিক ও একা একা দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক নির্মাণবাদীরা মনে করেন, এই ধরণের সত্য/ প্রমাণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। লাতুর দ্বিতীয় ঘরাণার অনুসারী।

লাতুরের *ল্যাবরেটরি লাইফ* বই থেকে উৎপাদিত 'সামাজিক নির্মাণ' দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে, যা পরবর্তীতে *সায়েন্স ইন অ্যাকশন* বইয়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। 'বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড এক ধরণের সামাজিক বিধি'- এই দাবী প্রচন্ড সমালোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানকে বোঝার এই ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে 'সেল্ফ সার্ভিং ফিকশন' বলেও দাবী করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দীর্ঘদিন আলাদা হয়ে ছিলো। নানা সমালোচনা সত্ত্বেও, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার সাথে দীর্ঘদিন ধরে চলা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিচ্ছেদকে সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে লাতুর প্রথমে একত্র করার চেষ্টা করেন। প্রবল সমালোচনার মধ্য দিয়ে হলেও সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্য তারপর থেকে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ও পরীক্ষাগার নিয়ে আলোচনার পরিসর তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানের সত্য নির্মাণের কলাকৌশলকে দৃঢ়ভাবে সমালোচনা করা সেই লাতুর আবার বিজ্ঞানেই ফিরে এসেছেন।

'না-মানুষ' ও অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি

প্রাকৃতিক দুনিয়া কি কি শক্তি ও বস্তুগত উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি তা নিয়ে এক ধরণের সর্বজনমান্য বোধগম্যতা আছে। আবার সামাজিক দুনিয়ার শক্তি ও বস্তুগত উপাদান সম্পর্কে প্রায় সবারই কিছু ধারণা আছে বলে মনে করা হয়। ব্যক্তি মানুষ কীভাবে তার দুনিয়াকে

ব্যাখ্যা করে এবং এগুলোকে আমলে নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা তৈরি করা হয় -এই দুই বোধগম্যতার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান।

২০০৫ সালে মিশেল ক্যালন ও জন ল এর সাথে যৌথভাবে লাতুর *রিএসেমব্লিং দ্য সোশাল: এন ইনট্রোডাকশন টু অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি* নামের বইটি প্রকাশ করেন[6]। এই বইটিকে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি'র অন্যতম প্রধান প্রকাশনা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। আর একারণে অবধারিতভাবেই লাতুর এই তত্ত্বের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। লাতুর এই বইতে, অনুশীলনধর্মী অধিবিদ্যার কথা বলেছেন। যার মানে, বাস্তব হচ্ছে তাই, যা একজন কারক (অ্যাক্টর) তার কাজের জন্য প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেন। কেউ একজন অলৌকিক কোন অনুপ্রেরণায় গরীব লোকজনকে সাহায্য করতে পারেন। এখানে এই অলৌকিকতার উপস্থিতির একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে, তবে এটা কোনভাবেই সামাজিক বিষয় নয়। লাতুর এ ক্ষেত্রে নানান মানুষকে এক পরিসরে নিয়ে আসা ও কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ধারণার দিকে প্রত্যক্ষণধর্মী নজর দেওয়ার কথা বলেছেন।

এই তত্ত্বে বুদ্ধিবৃত্তিক অ-বস্তুগত প্রত্যয়সমূহ যেমন, সমাজ, পুজিবাদ ও অর্থনীতিকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। বলা যায়, এসব প্রত্যয়কে ব্যবহার না করে বিকল্প কি ব্যবহার করে এসবের মানে তৈরি করা ও তা সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে যৌথতা তৈরির জন্য ব্যক্তি বা বস্তুর একক ভূমিকার প্রতি নজর দেয়া হয়। যে কারণে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরিকে সমতল জ্ঞানতত্ত্ব (ফ্ল্যাট অনটোলজি) বলা হয়, যার মানে হচ্ছে, মানুষ, না-মানুষ (নন-হিউম্যান), প্রত্যয় ও কল্পচরিত্র সবাইকে এখানে একই রকমভাবে দেখা হয়। এইসব সত্তাকে এখানে কারক (অ্যাক্টর/ অ্যাক্টেন্ট) নামে ডাকা হয়। এসবের পরিচিতি ও মর্যাদা সমাজে যাই হোক না কেন, প্রত্যেককেই অন্য বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দিয়ে বোঝা বা চিহ্নিত করা হয়। এদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের পেছনে আর কোন অতিরিক্ত বস্তুগত সারমর্মতা লুকায়িত থাকেনা। তবে পরবর্তীতে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি নিয়ে লাতুরের অবস্থান পাল্টেছে। এই পাল্টানোর একটা কারণ বিভিন্ন রকমের আসল বা সত্য পরিস্থিতির মধ্যে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি পার্থক্য করতে সক্ষম নয়, যা ভিন্নভিন্ন ধরণের বাস্তবতা তৈরি করে। এই সমস্যা সমাধান করার ইচ্ছা নিয়ে লাতুর পরবর্তীতে 'অস্তিত্বের নানান ধরণ' প্রকল্পে কাজ করেছেন।

অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি অনুসারে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটা সর্বব্যাপী নেটওয়ার্কের অংশ। এই নেটওয়ার্কের প্রত্যেক উপাদান একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। কিভাবে একটা বিষয়ী (অবজেক্ট) এই নেটওয়ার্কের মধ্যে মানুষের মতো বা সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? এই ধারণাটাই সনাতনী সমাজবিজ্ঞানকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরিতে লাতুর সমতল জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহার করে একটা পদ্ধতিগত প্রতিসাম্যর (মেথডোলজিক্যাল সিমেট্রি) ধারণা আমাদের সামনে নিয়ে এলেন। নেটওয়ার্কে উপস্থিত থাকা মানুষ, প্রত্যয়, বস্তু, দর্শন, অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ ও মতবাদ -সবাইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হলো। কে মানুষ আর কে মানুষ নয় কিংবা কম্পিউটার, সুনামি, তালিবান, মার্কিন, চেয়ার, টেবিল, তরবারি, কলম, ইলেকট্রন ও প্রোটন -সবারই এজেন্সি আছে। কেউ বড় বা কেউ অতি ক্ষুদ্র, তবে নগণ্য নয়। কেউ হয়ত কাউকে তৈরি করেছে। কোন কিছু হয়ত অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারছেনা। কাউকে হয়ত খালি চোখে দেখাই যায় না। কেউ হয়ত এত বড় যে পুরোটা একবারে দেখাই সম্ভব নয়। এগুলোই লাতুরের কারক (অ্যাক্টর)। তবে লাতুরের সমতল জ্ঞানতত্ত্ব অনুসরন করে 'অ্যাকটেন্ট' বললে মানুষ ও না-মানুষের প্রভেদ লুপ্ত হয়। এই তত্ত্বে সকল সত্তা একই রকমভাবে ক্ষমতাশালী নয়, কিন্তু তারা একইরকম বাস্তব[7]। না-মানুষেরও

এজেন্সি আছে, মানুষের মতোই। যেখান থেকে লাতুর মূলত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও জ্ঞানপদ্ধতিগত অবদান রেখেছেন। এই অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি একই সাথে তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতিও। অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরির যে পদ্ধতিগত পাটাতন তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারার ক্ষেত্রে একটা সাংঘাতিক জটিলতা আছে। সেই জটিলতার মূল কারণ হচ্ছে যে এতদিন পর্যন্ত এজেন্সির ব্যাখ্যায় কেবলমাত্র মানুষ বা মানুষস্থানীয় বিষয়সমূহেরই এজেন্সি আছে বলে আমরা ধরে নিতাম। লাতুর প্রথম আমাদের সামনে "নন-হিউম্যান অ্যাক্টর" প্রত্যয় আমদানী করলেন, যারা মানুষ না। এদের নাম দিলেন 'অ্যাকটেন্ট', যাদের এজেন্সি আছে। যখনই লাতুর মানুষ ও না-মানুষের প্রভেদ মিলিয়ে দেওয়া 'অ্যাকটেন্ট'কে গুরুত্ব দিলেন, তখনই সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথাগত চিন্তা সাংঘাতিক রকমের ধাক্কা খায়।

অ-আধুনিকতার ইস্তেহার

নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে 'আধুনিকতা' একটি তত্ত্ব নির্ধারক প্রপঞ্চ। এই প্রপঞ্চের আলোচনা অনেকটা প্রাক-আধুনিক, আধুনিক ও উত্তর-আধুনিকতার ক্রমবিকাশ অনুযায়ী প্রচলিত আছে। এই দুই বিদ্যায়তনিক শাস্ত্রে তত্ত্ব বিকাশের পরম্পরাও সরাসরি আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতা দ্বারা চিহ্নিত করার রীতি রয়েছে। এই দুই শাস্ত্রে ধরেই নেওয়া হয়েছে– আধুনিকতা আছে, আধুনিকতার সমালোচনাও আছে, তবে তা হয় প্রাক-আধুনিক (অনেকে গতানুগতিকতা দিয়েও এই প্রবণতাকে চিহ্নিত করেছেন) ও উত্তর-আধুনিকতার বাতাবরণে। এই ধরণের আলোচনার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আধুনিকতার সমালোচনা করতে গেলেও আধুনিকতার অস্তিত্ব মেনে নিয়েই করতে হয়। এই বয়ান অনুসারে, উপনিবেশিকতার হাত ধরে বৈশ্বিক দক্ষিণের (গ্লোবাল সাউথ) উন্নয়নশীল ও অনুন্নত এলাকায় আধুনিকতা প্রবেশ করে। প্রাক-উপনিবেশিক সমাজকে প্রাক-আধুনিকতার সমার্থক মনে করার জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য রয়েছে। একটা সময়ে প্রতি-আধুনিকরা আধুনিকতার সমালোচনা করা শুরু করলে সেই আলোচনা এক সময় প্রাক-আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে যাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো, সেই বৈশিষ্ট্যকে আর ফেলে রাখা গেলো না। নৌকা, গরুর গাড়ি থেকে রেলগাড়িতে কিংবা ডিজেলচালিত বাসে উত্তরণকে আধুনিকতা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তনের কালে বলা হচ্ছে, আধুনিকতার মানে কার্বন পোড়ানো। ইউরোপ জুড়ে আবার ফিরে এসেছে বাই-সাইকেলের মতো 'লো-টেক' জমানার যানবাহন, যা পরিবেশবান্ধব। জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ায় না। নদীতে, পুকুরে ডিঙ্গি নৌকার আদলে ফিরে এসেছে 'কায়াক' নামের বৈঠাচালিত জলযান। এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করে সেই প্রাক-উপনিবেশ যুগের সমাজ ও প্রযুক্তিকে অ-আধুনিক বলে খারিজ করি?

লাতুর স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকতা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি এই জ্ঞানতাত্ত্বিক দশা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টারই ফসল, তাঁর বিখ্যাত বই, *উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন*। ১৯৯১ সালে ফরাসি ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়, বছর তিনেক পরে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে[৪]। এই বইতে লাতুর আমাদেরকে একদম নতুন একটা কথা জানাচ্ছেন, আমরা কখনও আধুনিক (মডার্ন) ছিলাম না। এর আগে সম্ভবত আমাদের বোঝা দরকার, আমরা আধুনিক বলতে আসলে কী বুঝি। আধুনিকতা নিয়ে বলতে চাইলে একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে বলতে হয়। শুরু করতে হয়, গতানুগতিক (ট্র্যাডিশন) দিয়ে, যা অনেক বছর ধরে বহমান, এটাই রীতি, এমনটাই হয়ে এসেছে, এমন সব কায়দা-কানুন ও জীবনাচার। বেশ কিছু প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গতানুগতিকতা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যুক্তি -সে ধরণের কিছু শর্ত। আধুনিক হওয়ার মোটামুটিভাবে একটা সর্বমান্য একরৈখিক পথ রয়েছে, যেটাকে অনুসরণ করে আধুনিক হওয়া যায়। এরপর উত্তর-আধুনিক (পোস্ট-মডার্ন) একটা প্রবণতা

এসে আধুনিকতার একরৈখিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারপর থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতা ডিসকোর্সের যুগপথ সহাবস্থান।

উল্লেখিত বইতে লাতুর দেখাচ্ছেন, যদি বিজ্ঞান অধ্যয়ন ঠিকঠাক প্রকৃতি ও সমাজের প্রভেদকে মুছে ফেলতে পারে, তাহলে একটা কঠিন বৈপরীত্য মেনে নিয়ে আমাদের পক্ষে বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে না। আমরা সবসময় সামাজিক নির্মাণবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যেই হাবুডুবু খেতে থাকবো। লাতুর এই বৈপরীত্যের উৎস খুঁজতে চেয়েছেন, আধুনিতার ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন, এবং আনুপাতিক নৃবিজ্ঞানের সামষ্টিকতার বিকল্প কিছু আমাদের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেছেন।

আমরা বহু শতাব্দী ধরে চলতে থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণার সাথে যুক্ত করছি। বহু বছর ধরে চলমান যে বাস্তবতা তা গত ৩০ বছরের মধ্যেই পাল্টে গেছে নাকি চিন্তা পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা একই বিষয়কে ভিন্নভাবে ফ্রেম করছি? আমাদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, অতীতকে আর আসলে নতুন করে নির্মাণ করা যায়না। লাতুর দেখিয়ে দিলেন, যখন আমরা অতীতকে কেবলমাত্র বিষয়ী (অবজেক্ট) হিসেবে ভাবতে পারি তখনই কেবলমাত্র আমরা অতীতকে নির্মাণ করতে পারি। লাতুর আমাদের সামনে ওজনস্তরের ক্ষয়কে উদাহরণ হিসেবে হাজির করলেন। তারপর একটা প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, আমরা এমন কোনো একটা গবেষণার কথা ভাবতে পারি কি না যেটা একই সাথে প্রাকৃতিক, সামজিক ও অবিনির্মিত।

লাতুর আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে চিন্তার দুইটি মেরু বা পুলের কথা বলছেন। একটি হচ্ছে প্রকৃতি (নেচার) এবং আরেকটি হচ্ছে সংস্কৃতি (কালচার)। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি আসলে বলেছেন বিজ্ঞানের কথা। আবার সংস্কৃতি বলতে বলেছেন রাজনীতির কথা। অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি ও সংস্কৃতি নামের দুইটি মেরুর অন্তরালে বলেছেন বিজ্ঞান ও রাজনীতির কথা। এই মেরু দুইটি দিয়ে আমরা দুই রকমের চিন্তা নির্মাণ করতে পারি। এই দুইটি মেরু আসলে দুটি আলাদা সত্তা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আছে।

যখন এই দুইয়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে, তখন আমরা তাকে দোআঁশলা (হাইব্রিড) বলতে পারি। এটা যখন ঘটে, তখন একটা আরেকটার মধ্যে এমন ভাবে মিশে যায়, আমরা আর আলাদা করতে পারি না। তখন এই দুই মেরু খুব বড় প্যারাডক্স হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এটা থেকে আমাদের কোন উত্তরণ নেই বলে ধরে নিতে হয়। তিনি এই প্রবণতাকে বিষয় ও বিষয়ীর একটা দ্বৈতবাদ (ডুয়েলিজম: একই অঙ্গে দুইরূপ) বলে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই দুই সত্তা এমনভাবে মিশে গেছে যে আমাদের পক্ষে এ দুই সত্তাকে আর কখনোই আলাদা করা সম্ভব হয় না। এই ধারাবাহিকতায় মানবতাবাদ ও আধুনিকতাকে আমরা গুলিয়ে ফেলবো। লাতুর এখানে বলতে চেয়েছেন, আধুনিকতাকে আসলে আমরা মানবতাবাদ দিয়েই বুঝতে চেয়েছি। এবং এর বাইরে আধুনিকতার কোনো মানে তৈরি করতে চাই নি। তিনি আরও উল্লেখ করছেন, আধুনিকতা একটা অভ্যাস। এখানে বিষয় ও বিষয়ী আছে, তাদের এজেন্সি আছে। এই দুই ধরণের বর্গ নিয়ে যদি আমরা সংবিধান রচনা করতে যাই তাহলে কে আসলে এই সংবিধান লেখায় মূল দ্বায়িত্ব নেবে। কম্পিউটার নিজে নাকি কম্পিউটারের পেছনে থাকা পরিচালক। যন্ত্র নাকি যন্ত্রের পেছনের মানুষটি। উত্তর তাহলে দুটিই। কেননা এই মিশে যাওয়া ঠেকানো যাচ্ছেনা।

আবার প্রকৃতিকে আমরা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ প্রকৃতি হিসেবে দেখতে পারি বটে, কিন্তু আমরা যে প্রকৃতিকে চিনি, প্রকৃতির সেই চেহারা বিজ্ঞান আমাদের সামনে হাজির করে। যে কারণে বিজ্ঞান হচ্ছে সেই লেন্স যার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতিকে খুঁজে পাচ্ছি। অর্থাৎ প্রকৃতিকে

আমরা আমাদের ভাষায় ও আলোচনায় যেভাবে দেখি, তা আসলে কী? এটি প্রাকৃতিক নাকি সামাজিক নাকি অবিনির্মিত? এই মিশে যাওয়ার ব্যাপারটাকে মূলত লাতুর চিহ্নিত করছেন হাইব্রিডাইজেশন নামে। কাজেই কোন একটি নির্দিষ্ট ডিসিপ্লিন অতিক্রম করে যখন মাল্টি-ডিসিপ্লিনারিটি অথবা ইন্টার-ডিসিপ্লিনারিটির কথা বলা হয় তখন তা স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকতাকে অতিক্রম করে যায়।

এই হাইব্রিডাইজেশনের বিপরীতে লাতুর বিশুদ্ধীকরণ (পিউরিফিকেশন) এর কথা বলেছেন। এই হাইব্রিডাইজেশন থেকে বিশুদ্ধকে আলাদা করতে পারা খুব সহজ কাজ নয়। প্রকৃতি-সংস্কৃতি এই দুই মেরুর অস্তিত্ব যদি একই সাথে মিশে যায়, মিশে যাওয়ার আগে তারা আলাদা দুটো অস্তিত্ব ছিল, তাহলে আমরা ওই দুটো মেরুকে কীভাবে আবার ফেরত পেতে পারি, সেই জটিলতা রয়ে গেছে। মিশে যাওয়া অবস্থায় নিজেদেরকে তারা কীভাবে কথা বলবে, প্রতিনিধিত্ব করবে-সেই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। লাতুর এই জটিল সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎসেকে[9] মনে করছেন। যিনি বলেছেন, এই আধুনিকতাকে সংজ্ঞায়ন করার সমস্যাটা হচ্ছে ঠান্ডা পানিতে গোসল করার মতো। অর্থাৎ ঠান্ডা পানিতে আপনি যত দ্রুত নামবেন তার চেয়েও দ্রুত আপনি উঠে আসতে চাইবেন। কাজেই আমরা আধুনিকতার মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারি বটে, ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি এবং সংস্কৃতি মেরুর মধ্যে যে দ্বৈতবাদ (পিউরিফিকেশন এবং হাইব্রিডাইজেশন) সেখানে আমরা প্রবেশ করবো এবং খুব দ্রুত আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকবো।

আবার এই যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি -একজন আধুনিক মানুষের (যদি থাকতো!) পক্ষে এই দুই মেরুকে খুব স্পষ্টভাবে আলাদা করে রাখা সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীতে আমরা সম্ভবত এমন কোনো তত্ত্ব তৈরি করতে পারিনি, যার ডিসকোর্সের আওতায় দুটো প্রান্ত মিশে যায় না। মিশে যাওয়া পর্যন্ত লাতুর কোনো সমস্যা দেখেন না। তিনি বলছেন যে, মিশে যাওয়ার পর এটিকে কে প্রতিনিধিত্ব করবে -এই সংক্রান্ত ধারনা আধুনিকতা দেয় না। কাজেই আধুনিকতার এই ধারনা নিজেই আসলে একটি অ-আধুনিক আলোচনা। লাতুর সবশেষে হাজির হয়েছেন এই ধারনা নিয়ে যে, আসলে ঐ অর্থে আমরা কখনো আধুনিক ছিলাম না। এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বলছেন যে, আধুনিকতা কখনো শুরু হয় নি, এটি হওয়া সম্ভবও ছিলো না কখনো।

পর্যালোচনা ও উপসংহার

লাতুরের সমাজচিন্তার সাথে বাংলাভাষী পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় থেকে এই প্রবন্ধের শুরুতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেছি। এরপর তাঁর তত্ত্ববিশ্ব থেকে সমাজবিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী পাঠকদের জন্য উপযোগী হবে বিবেচনা করে তিন ধরনের তত্ত্বায়নের উপর পর্যালোচনাধর্মী আলোচনা হাজির করেছি। তত্ত্বায়নসমূহ হচ্ছে: প্রথমত, সামাজিক নির্মান, বাস্তবতা ও বিজ্ঞান; দ্বিতীয়ত, 'না-মানুষ' ও অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি; ও তৃতীয়ত, অ-আধুনিকতার ইস্তেহার। এই অংশে লাতুর প্রদত্ত তিন ধরণের তত্ত্বায়ন সম্পর্কে জ্ঞানজগতে প্রচলিত থাকা সমালোচনাসমূহকে আমলে নিয়া হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক বাস্তবতা (সোশ্যাল ফ্যাক্ট) অনুধাবনে এমিল ডুর্খিমকে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত দিক থেকে অগ্রগণ্য বলে মনে করা হয়। এমিল ডুর্খিমের *সামাজিক*কে সামাজিক বাস্তবতা দিয়েই বোঝার কায়দাকে লাতুর অমান্য করেছেন। কারণ লাতুর মনে করেছেন, বস্তু বা প্রযুক্তির ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে *সামাজিক*কে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এখানে প্রাণহীন জড়বস্তুও 'সামাজিক বস্তু' হিসেবে গণ্য করা হয়। 'সামাজিক বস্তু'কে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গীকে তাই অতীন্দ্রিয় ও ছদ্ম বলে সমালোচনা আছে[10]। আবার বিজ্ঞান বলতে লাতুর সামাজিক ও

কৃৎকৌশলগত উপাদানকে আলাদা করেন নি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত সত্যের সর্বজনীনতাকে আশ্রয় করে বিজ্ঞানের যে প্রবল ভাবমূর্তির সমালোচনা লাতুর করেছেন, তাকেও একধরণের স্বেচ্ছাচারিতা হিসেবে বিবেচনা করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা কড়া প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞানকে সবসময় নির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করার প্রচেষ্টাকে সাধারণ মানুষের সামনে বিজ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করার পাগলামি হিসেবে দেখা হয়।

লাতুর রাজনৈতিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে না-মানুষদের এজেন্সি না থাকাকে জোরালো সমালোচনা করেছেন। আর তাই তাঁকে মোটাদাগে না-মানুষকে এজেন্সি দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়[11]। এটা বলা হয়ে থাকে যে, প্রাণহীন বস্তু বা যন্ত্রের নিজস্ব জড়সত্তার জন্য কোনও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা ইচ্ছাশক্তি থাকেনা, যা কেবলমাত্র মানুষেরই থাকে। কাজেই মানুষের এজেন্সি থাকলেও ও না-মানুষের এজেন্সি বাতুলতা মাত্র। লাতুরকে এখানে অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে, লাতুর সমাজ গঠন সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণায় মানুষের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছেন, বস্তুকে পদ্ধতিগত প্রতিসাম্যের নামে মানুষের সমান বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই সনাতনী সমাজবিজ্ঞানে 'সমাজ', 'সামাজিক', ও 'সামাজিক সম্পর্ক' বলতে যা বোঝানো হয়, লাতুরের সমাজ ও এর গঠন তেমনটা নয়। কারণ এটা কেবল মানুষের সমাজ নয় (দেখুন, লিনডেম্যান, ২০১১)। এই ধারাবাহিকতায়, অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরিকেও সমালোচনা করা যায় এই বলে যে, পদ্ধতিগত প্রতিসাম্যের দোহাই দিয়ে নামে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিতে এক ধরণের নৈরাজ্য চালুর চেষ্টা করা হয়েছে।

আধুনিকতা বিষয়ে লাতুরের বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক আধুনিকতাবাদী পার্থক্য কখনো অস্তিত্বশীল নয়, কাজেই মানুষের পক্ষে আধুনিক হওয়া সম্ভব নয়। লাতুর এই দুই মেরুর মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে গিয়ে দাবী করেছেন আমরা বড়োজোর অ-আধুনিক। এই আলোচনায়, লাতুর আধুনিকতা বলতে আসলে যা বোঝায় ও আধুনিকতা বলতে আমরা যা বুঝি- এই দুইয়ের পার্থক্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে বলতে চেয়েছেন- আধুনিক হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিকতা সংক্রান্ত লাতুরের এই ভাবনা-পদ্ধতিকে এই বলে সমালোচনা করা হয়েছে যে, এটা যথেষ্ট কার্যকর নয়। বিশেষ করে যখন প্রাক আধুনিক ঐতিহ্যসমূহকে শোষণমূলক ও ক্ষেত্রবিশেষে কিছু সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর[12] বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

1. Tesch, Noah. "Bruno Latour". *Encyclopedia Britannica*, 18 Jun. 2021, https://www.britannica.com/biography/Bruno-Latour.
2. http://www.bruno-latour.fr/biography.html
3. Latour, Bruno and Steve Woolger (1979). *Laboratory Life: the Construction of Scientific Facts,* Princeton: Princeton University Press.
4. Latour, Bruno (1987). *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society,* Cambridge Mass: Harvard University Press.
5. https://www.nytimes.com/2018/10/25/magazine/bruno-latour-post-truth-philosopher-science.html
6. Latour, Bruno (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory,* New York: Oxford University Press.

7. Harman, Graham., Latour, Bruno (1947–), 2016, doi:10.4324/9780415249126-DD106-1. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, Taylor and Francis, https://www.rep.routledge.com/articles/biographical/latour-bruno-1947/v-1.

8. Latour, Bruno (1993/1991). *We Have Never Been Modern.* Translated by Catherine Porter, Cambridge: Harvard University Press.

9. Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900 (2006). *Thus spoke Zarathustra: a book for all and none*, Cambridge: Cambridge University Press.

10. Stemenkovic, Philippe (2020). The contradictions and dangers of Bruno Latour's conception of climate science, Disputatio. *Philosophical Research Bulletin*, 9 (13): 1-34.

11. Lindemann, Gesa (2011). On Latour's Social Theory and Theory of Society, and His Contribution to Saving the World, *Hum Stud*, 34: 93-110.

12. Sassower, Raphael. 2022. Why Does Latour the Postmodern Critic Still Matter? *Social Epistemology Review and Reply Collective*, 11 (12): 1-9.